আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

অচিন্ত্যকুমার মাইতি

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণের যুগ। সেই যুগে জগদীশচন্দ্র বসুর আবির্ভাব। পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মে তিনি গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাননি, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁকে গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন— "বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।....যদি কেহ কোনো বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল নিরপেক্ষ হইতে পারেন। ....বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।" জগদীশচন্দ্রও সেইভাবেই বিজয়ী হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যদি স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি হয়তো তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জগৎকে আরও কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। নোবেল পুরস্কারের মতো জয়মাল্য না পরতে পেরে তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিল না। তিনি কখনোই যশের কাঙাল ছিলেন না। তিনি বিজ্ঞানের সাধনা করতে গিয়ে এক চরম সত্যকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, সেই চরম সত্য অনুসন্ধানে তাঁর কাছে সমস্ত প্রকারের অধীত বিদ্যা একাকার হয়ে গেছে। তাই তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী থেকে একজন সফল উদ্ভিদবিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানচর্চার সাথে সাথে তিনি সাহিত্যের চর্চাও করে গেছেন। বিপরীতধর্মী বিষয়ের এরূপ যুগলবন্দি বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। 'অব্যক্ত' বইখানি তাঁর সাহিত্য- প্রতিভার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ কয়েকজন ক্ষণজন্মা মনীষীর আবির্ভাব বাঙালি জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের মতো বিস্মৃতপ্রায় মনীষীদের জীবনকথা আজকের এই অবক্ষয়প্রাপ্ত জাতির মনে চেতনা আনে, সেই আশায় জগদীশচন্দ্রের জীবন ও চরিত্র চিত্রণের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অচিন্ত্যকুমার মাইতি

ওঁ

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জন-কোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি এক যেথা একাকী বিরাজে
চন্দ্র সূর্য পুষ্পপত্র পশুপাখী ধূলায় প্রস্তরে, —
একটি জাগ্রত প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে! মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতি দূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে —
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপ রশ্মির অন্বেষণে
লোক লোকান্তের অন্তরালে, — যেথা পূর্ব ঋষিগণ
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড় হাতে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে যে নবজাগরণের তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই স্পর্শে সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসেছিল এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং সে পরিবর্তনের ভাবধারায় যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁরা হলেন সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ; সংস্কৃতিতে গিরীশ ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন; শিল্পকলায় নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞানে নবপথের অন্যতম দিশারি ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানী। তিনি এক বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর জীবন একটি তীব্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কেটেছে—অদম্য মনোবল ও প্রতিভার এক সমন্বয়ের মাধ্যমে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় হয়ে আছে।

জগদীশচন্দ্রের জন্মের পূর্বে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি কেমন ছিল এবং দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ কেমন ছিল সে

বিষয়ে আলোচনা না করলে তাঁর নানা বিষয়ের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবে না। বিজ্ঞানজগতের অঙ্গনার কোন্ সীমায় তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বর্ণময় ছটা পৌঁছে দিয়েছেন তা জানতে গেলে জগদীশচন্দ্র বসুর প্রাক আবির্ভাবকালের বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।

বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা হত। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, লীলাবতী, চরক, সুশ্রুত এবং প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ বৌদ্ধ নাগার্জুনের নাম ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। কিন্তু এরপর প্রায় হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় নানা প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে। এই রুদ্ধদ্বার আবার উন্মোচিত হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতে পুনরায় শুরু হল বিজ্ঞানচর্চা। বিজ্ঞান সাধনা নতুন করে গতি পায় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল—এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করা এবং প্রকাশনা করা। প্রথমে ইউরোপীয়রাই এই সোসাইটির সদস্য হতে পারতেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয়রা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন। এঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন ও শিবচন্দ্র সেন প্রমুখ ছিলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। মিশনারিরা ইংরেজি শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মিশনারি কেরী সাহেব বিজ্ঞান শিক্ষার পরিকল্পনা করলেন। কেরী সাহেবের উদ্যোগকে ইংরেজরা ভালো চোখে দেখলেন না। সরকারি বিরোধিতার মুখে পড়ে কেরী সাহেব শ্রীরামপুর চলে এলেন। সেখানে তিনি একটি কলেজ খুললেন এবং জন ম্যাক নামে একজন শিক্ষককে রসায়ন পড়াবার জন্য নিযুক্ত করলেন। জন ম্যাক এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে এসেছেন। ম্যাক বাংলাভাষায় রসায়নের একটি বইও লিখেছিলেন। ভারতীয়

ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের বই হিসেবে এটাই প্রথম প্রকাশনা। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকেরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বড়োলাট আমহার্স্টের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার দাবি করেন। বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে তিনি বিশেষ করে গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রসায়নের উল্লেখ করেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে জেমস প্রিন্সেপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেজর হার্বট ও জেমস প্রিন্সেপ যুগ্মভাবে 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পরে পত্রিকাটির নামকরণ হয় 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হন প্রিন্সেপ সাহেব। পত্রিকাটিতে প্রিন্সেপের বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল মেডিকেল কলেজ। শুরু হল আধুনিক ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা। এরপর প্রতিষ্ঠিত হল বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এইগুলি সবই কলকাতায়। চুঁচুড়াতে স্থাপিত হল হুগলি মহসীন কলেজ। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ থেকে চারজন বাঙালি ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এঁরা হলেন—উমাচরণ শেঠ, নবীনচন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ দে ও দ্বারকানাথ গুপ্ত। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে উচ্চশিক্ষার্থে প্রথম বিলেত যান ভোলানাথ বসু, সূর্যকান্ত চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপালচন্দ্র শীল। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রস্তাব করল যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাটার্নে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন- পাঠন, আইন-কানুন—এইসব হবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল

মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার কীভাবে ঘটানো যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বছরেই ঘটল সিপাহি বিদ্রোহ। এই দুটি ঘটনা বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—একটি শিক্ষা জগতের পরিবর্তন আনল এবং অপরটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন আনল। দুটি ঘটনারই প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সিপাহি বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশে এক নবশক্তির সূচনা হল, যা বিজ্ঞানের নব অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের দাবানল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে—ভারতকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত। সিপাহি বিদ্রোহের প্রায় এক বছর পরে জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। এই পারিপার্শ্বিক বাতাবরণেই গড়ে ওঠে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্ম। জন্মস্থান অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ শহর। জগদীশচন্দ্রের পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামে। সেন রাজাদের রাজধানীর আমল থেকেই বিক্রমপুর ছিল বিখ্যাত। বিক্রমপুর তখন ছিল শিক্ষায় অগ্রণী। কথিত আছে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান এখানে জন্মেছিলেন। এখানে আরও কৃতী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সরোজিনী নাইডুর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তখন যে বিদ্যাচর্চা হত তার চিহ্ন বহুদিন পর্যন্ত টোলগুলিতে অব্যাহত ছিল। কালে কালে এসমস্ত টোলগুলিতে ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষার চর্চা হত। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র শৈশব থেকেই নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে সরকারি অর্থানুকূল্যে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয় এবং ভগবানচন্দ্র সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার নেন।